International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-V, September 2024, Page No.19-29
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.10.issue.05W.003

দার্শনিক প্রেক্ষাপটে ভালো থাকা : একটি সমীক্ষা

রাসপতি মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Happiness or wellbeing is good for every human being. Each person's happiness is a good to that person, and the general happiness, therefore, a good to the aggregate of all persons. A's happiness is a good to A. B's happiness is a good to B. C's happiness is a good to C's aggregate of all persons. Therefore, general happiness is a good to all. According to J. S. Mill's theory, we should all try to be good. He says, "The utilitarian doctrine is that happiness is desirable, and the only thing desirable, as an end; all other things being only desirable as means to the end. His Ethical Hedonism is based upon Psychological Hedonism. He offers the following proof Ethical Hedonism. We always desire pleasure; therefore, pleasure is desirable." He also said that, "The only proof capable of being given that an object is visible is that people actually see it. The only proof that a sound is audible, is that people hear it, the sole evidence that anything is desirable, is that people do actually desire it." All persons desire pleasure; so pleasure is desirable.

In spiritual Indian philosophy, human pursuits are mainly divided into four categories - Dharma, Artha, Kāma and Mokṣa. Among these four puruṣārthas, the ultimate desire of man is moksha. Also I will discuss the role of Pancamahārata for human well-being in discussion article.

Keywords: Hedonism, Eudaemonism, Idealism, Pancamahāvrata, Puruṣārtha.

মানুষের ঐচ্ছিক চাওয়া হলো 'ভালো থাকা'। সুখবাদীদের মতে, সুখই মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য। মানুষ সুখলাভের আশায় কাজ করে এবং সুখের জন্যই মানুষের কাজ করা উচিত। কিন্তু কল্যাণবাদীদের মতে, আত্মোপলব্ধিই (Self-realization) মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। মানুষ যেহেতু জীববৃত্তি ও বিচারবুদ্ধি সুসম্পন্ন সেহেতু তার মধ্যে যেমন লাগামছাড়া কামনা-বাসনা থাকবে তেমনি ভালো থাকার জন্য সেই কামনা-বাসনাকে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কল্যাণবাদীদের মতে, কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় সুপথে পরিচালিত করা। পূর্ণতাবাদ বা কল্যাণবাদের প্রধান প্রবক্তা হেগেলের বিখ্যাত উক্তি হলো 'মানুষ হও (Be a person)'। অর্থাৎ তোমার মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব আছে তা উপলব্ধি করো। পশু এবং মানুষের মধ্যে পার্থক্য হলো পশুর ব্যক্তিত্ববোধ নেই কিন্তু স্বাতন্ত্র্যবোধ (Individuality) আছে। আর মানুষের ব্যক্তিত্ববোধ এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ উভয়ই আছে। প্রত্যেক পশু নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে বাঁচিয়ে রাখার

জন্য চেষ্টা করে, অন্য পশুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, সে অপরের চিন্তা করে না। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্যবোধ নেই তা নয়। সেও সময়ে সময়ে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তবে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ মানুষের যথাসর্বস্ব নয়। তার মধ্যে একাত্মবোধও আছে, অর্থাৎ সে সমাজের সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে চায়। তার মধ্যে সহানুভূতির ভাবও বিদ্যমান। অপরকে সাহায্য করে, অপরের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে মানুষ আত্মবিস্তৃতি লাভ করতে চেষ্টা করে, এটাই মানুষের বৈশিষ্ট্য, এটাই মানুষের ব্যক্তিত্ব (Personality)। তাই হেগেল বলেন, পূর্ণতালাভ করতে হলে মানুষকে সকলের মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে, সকলের মঙ্গলের মধ্যে নিজের মঙ্গল উপলব্ধি করতে হবে, অর্থাৎ তাকে মানুষ হতে হবে।

সুখবাদ (Hedonism): সুখবাদ অনুযায়ী সুখই আমাদের প্রতিটি মানুষের কাম্যবস্তু হওয়া উচিত। প্রতিটি মানুষের সুখ অন্বেষণ করা উচিত। মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী মানুষ সাধারণত সুখ চায় কিন্তু নীতিবিদ্যাসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী মানুষের সুখ চাওয়া উচিত। নীতিবিদ্যায় সুখবাদকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা — (১) আত্মসুখবাদ (Egoistic Hedonism) ও (২) পরসুখবাদ (Altruistic Hedonism)। আত্মসুখবাদ অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের নিজের জন্য সর্বাধিক সুখ অন্বেষণ করা উচিত। ব্যক্তির সুখই নৈতিক আদর্শ বা নৈতিক বিচারের মাপকাঠি। অপরপক্ষে, পরসুখবাদ বা সার্বিক সুখবাদ অনুসারে সকলের সুখ হয়তো আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। সেইজন্য পরসুখবাদ সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখকে (the greatest happiness of the greatest number) আমাদের জীবনের নৈতিক আদর্শ বলে নির্ণয় করেছে। তাই বলা হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত অধিক লোকের মঙ্গল সাধিত হয় ততই শুভ। এই মতবাদকে সুখবাদ (Hedonism) নামে অভিহিত না করে অনেকে উপযোগবাদ (Utilitarianism) নামে অভিহিত করেছেন। একে বহু সুখবাদও বলা যেতে পারে। এই মতবাদ অনুসারে সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনই নৈতিক আদর্শ বা নৈতিক বিচারের মাপকাঠি। বেন্থামের মতে, মানুষের সুখের সন্ধান করা এবং দুঃখকে পরিহার করা একমাত্র উদ্দেশ্য। মিলের মতেও মানুষ সকল সময় সুখ কামনা করে এবং সুখই মানুষের একমাত্র কাম্য বস্তু। তবে ডঃ সিজউইক (Dr. Sidgwick) বলেছেন, "The impulse towards pleasure, if too predominant defeats its own aim."[1] অর্থাৎ সুখের প্রতি আবেগ যদি খুব বেশি হয়, তবে তার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়। জীবনে অপ্রত্যাশিত সুখই শ্রেষ্ঠতম সুখ (Unexpected pleasure is the greatest pleasure in life)। সুখলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সুখকে ভুলে থাকা (The best way to get pleasure is to forget it)।

কল্যাণবাদ (Eudaemonism): কল্যাণবাদ অনুযায়ী মানব জীবনের পরমকল্যাণ (Highest good) হলো আত্মোপলব্ধি (Self-realization) বা পূর্ণতালাভ (Perfection)। আত্মোপলব্ধি বলতে আমরা বুঝি, মানুষের ব্যক্তিত্বের (Personality) পূর্ণ বিকাশ। প্রতিটি মানুষের মধ্যে অনেক রকমের শক্তি আছে। যথা- শারীরিক শক্তি, বিচার শক্তি, সৌন্দর্যবোধ শক্তি এবং নৈতিক শক্তি। মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ বলতে আমরা বুঝি, মানুষের অন্তর্নিহিত যে শক্তিগুলি আছে, তাদের পূর্ণবিকাশ। সুতরাং যে কাজ আত্মোপলব্ধি বা

1. Henry, Dr. Sidgwick. *The Methods of Ethics.* London: Macmillan and Co. 1877, Page-41.

পূর্ণতালাভের সহায়ক সেই কাজ ভাল, আর যে কাজ আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতালাভের সহায়ক নয়, সেই কাজ মন্দ।

মানুষের মধ্যে দুইটি বৃত্তি আছে; একটি হচ্ছে তার ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি, আর একটি তার বিচার-বুদ্ধি। আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতালাভই যদি মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য হয় এবং এই আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতালাভই যদি নৈতিক বিচারের মানদণ্ড হয় তবে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় কোন্ বৃত্তির পূর্ণতালাভ মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য? সুখবাদিগণ বলেন, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির পূর্ণতালাভই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, কারণ তাঁরা মনে করেন, মানুষ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিগুলির সমষ্টি। আর বিচারবাদিগণ বলেন, বিচার-বুদ্ধির পূর্ণতালাভই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, কারণ তাঁরা মনে করেন, বিচার-বুদ্ধিই মানুষের যথাসর্বস্ব। সুখবাদ এবং বিচারবাদ উভয়েই চরমপন্থী মতবাদ। এই দুই মতবাদের কোনোটিই মানব-প্রকৃতির পূর্ণ স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করে না। তাই পূর্ণতাবাদিগণ বলেন, আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতালাভ বলতে আমরা যেমন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির পূর্ণতালাভ বুঝি না, তেমনি কেবলমাত্র বিচার-বুদ্ধির পূর্ণতালাভও বুঝি না। আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতা লাভ বলতে আমরা মানব-প্রকৃতির সম্যক পূর্ণতালাভকেই বুঝি, কারণ মানুষ কেবলমাত্র রক্তমাংসের সমষ্টিও নয়, আবার কেবলমাত্র বিচার-বুদ্ধিও নয়। মানুষ হলো রক্ত, মাংস এবং বিচার-বুদ্ধির সমষ্টি, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে জীববৃত্তি এবং বিচার-বুদ্ধি উভয়ই আছে। মানুষের জীববৃত্তি আছে বলে তার মধ্যে কামনা-বাসনা জাগবে এবং এই কামনা-বাসনাকে মানুষ তার বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করবে। আত্মোপলব্ধি বলতে পূর্ণতাবাদিগণ বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে কামনা-বাসনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকে বোঝান। তাঁদের মতে কামনা-বাসনার নিয়ন্ত্রণের অর্থ, কামনা-বাসনাকে বিনা বিচারে বর্জন করা নয় বা বিনা বিচারে তাদের চরিতার্থ করাও নয়, কামনা-বাসনার নিয়ন্ত্রণ হলো কামনা-বাসনাকে সুপথে চালিত করা। সুতরাং কল্যাণদীদের মতে আত্মোপলব্ধির অর্থ হলো বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে কামনা-বাসনার মধ্যে সঙ্গতি আনয়ন করে মানুষের আত্মার পূর্ণ বিকাশ সাধন করা। এখন তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, কল্যাণবাদ মানুষের ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি এবং বিচার-বুদ্ধি উভয়েরই দাবী পূরণ করছে, উভয়কেই মর্যাদা দিয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি কল্যাণবাদ সুখবাদ এবং বিচারবাদের সমন্বয় সাধন করে।

কল্যাণবাদীরা বলেন, আত্মসুখ ও পরসুখ পরস্পর-বিরোধী নয়। কারণ মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতা উভয় প্রবৃত্তিই বিদ্যমান। মানুষ কেবল তার নিজের সুখ কামনা করে না, পরের সুখও কামনা করে। পরের সুখের জন্য চেষ্টা করে মানুষ নিজেও সুখ পায়। মানুষ যদি পরের সুখের জন্য চেষ্টা করার সুযোগ না পায়, তবে তার নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তি বিকাশ লাভ করে না এবং তাতে সে সুখী হয় না। তাই মানুষ দেশের ও দশের সেবা করে পরকে আনন্দ দান করে এবং নিজেও পূর্ণতা এবং আনন্দ লাভ করে। এখানে দেখা যাচ্ছে কল্যাণবাদ আত্মসুখবাদ এবং পরসুখবাদের সমন্বয় সাধন করেছেন।

আদর্শবাদ (Idealism): আদর্শবাদ বা ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো। এছাড়া ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, শঙ্করাচার্য এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে সক্রেটিস, কান্ট, হেগেল, গ্রীন, ফিটকে, বার্কলে, স্পিনোজা প্রমুখ আদর্শবাদ বা ভাববাদের সমর্থক ছিলেন। ভাববাদীরা বলেন, মানসিক শান্তিই প্রকৃত শান্তি। তাই তাঁদের কাছে মানবজীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে মন । মনের মধ্যেই বসবাস করে মানুষের সুখ-দুঃখের অনুভূতি। মানসিক দিক থেকে শান্তি না থাকলে মানুষের পুরো জীবনটাই অশান্তিতে ডুবে যায়।

অর্থ-সম্পদের অভাব না থাকলেও যদি মানসিক শান্তির অভাব দেখা দেয় তাহলে জীবনটাই অকার্যকর হয়ে পড়ে। ডেল কার্নেগী মনে করেন, আত্মিক চিন্তা ভাবনার দ্বারাই মানসিক শান্তি অর্জিত হতে পারে। অহেতুক বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে মানসিক শান্তি নষ্ট হয়। এইসব বিষয় নিয়েই রচিত হয়েছে ডেল কার্নেগীর মূল্যবান গ্রন্থ 'মানসিক শান্তির সন্ধানে'।

'মানসিক শান্তির সন্ধানে' গ্রন্থে লেখক মানসিক শান্তি সম্পর্কিত নানা মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে মানসিক অশান্তি। আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কীভাবে মানসিক শান্তিকে রপ্ত করা যায়, তা নিয়ে লেখক সুচিন্তিত অভিমত রেখেছেন এই গ্রন্থে। এতে মানসিক শান্তি অর্জনের নিত্যনতুন উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়েই বলা হয়েছে , "মনে শান্তি রেখে ধনী হও নিজের মনকে জান, নিজের মতো জীবন কাটাও সাফল্যের জন্যে তোমার মধ্যে বিশাল শক্তি রয়েছে।"[2] কিন্তু যখন তোমার নিজের মনকে ভালো করে জানবে এবং নিজের মতো করে জীবন কাটাবে তখন তুমি তোমার মধ্যে লুকোনো শক্তি খুঁজে পাবে। নিজের ভেতরের সত্তার সঙ্গে যখন তুমি পরিচিত হবে, তখন যে সময়সীমার মধ্যে তোমার চাহিদা পূরণ করতে চাও, তা সহজে জিতে নেবে। কতগুলি বিশেষ কৌশল তোমার লক্ষ্য পূরণ করতে তোমায় সাহায্য করবে। আর প্রতিটি কৌশলই কিন্তু তোমার আয়ত্তের মধ্যে।

জীবন পথের কোনো এক সময়ে, প্রতিটি সফল মানুষই কিভাবে নিজের ইচ্ছেমতো জীবন কাটাবে তার নিশানা খুঁজে পায়? যত অল্প বয়সে তুমি এই শক্তিশালী ক্ষমতার সন্ধান পাবে তত সফলভাবে এবং সুখে জীবন কাটাতে পারবে। তবে জীবনের পরবর্তী সময়েও অনেকে অন্যদের দেখে তাদের জীবনের পথ পরিবর্তন করে এবং তাদের পছন্দমতো ভাবে জীবন কাটায়।

স্রষ্টা মানুষকে তার মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়েছেন। মানুষ যাতে নিজের মতো করে ভাবতে পারে, নিজের মতো জীবন কাটাতে পারে, নিজের লক্ষ্য পূরণ করতে পারে তার জন্য ভগবান মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। তোমার মধ্যে এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তুমি জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনের শান্তি লাভ করতে পারো। যেটা ছাড়া প্রকৃত সুখী হওয়া যায় না। অর্থাৎ ভালো থাকা যায় না।

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তাঁর নেতাদের আদর্শের কথা বলতেন যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে যদি মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাহলে কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে বসে মৌণ নীরবতা পালন করবে আর মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করবে যে অমুক কাজটি যদি করি তাহলে তার ফলে সমাজের নিম্নতম লোকটির কোনো উপকার কি সাধিত হবে, যদি হয় তাহলে সেই কাজ তৎক্ষণাৎ করতে লেগে যাবে।

বাস্তবে আদর্শবাদ অনুসারে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক হিতসাধনের নীতি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হতে পারে না। অনেক অনেক টাকাপয়সা রোজগার অথবা নিছক উপযোগবাদ (utilitarianism) ব্যবসা পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। যারা উপযোগবাদে বিশ্বাসী তাদের উদ্দেশ্যে স্বামী

2. মণ্ডল, রাসপতি. *শান্তি ও সংঘর্ষ সমাধানের দর্শন.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০২৪, পৃঃ ১২১।

বিবেকানন্দের সাবধানবাণী হলো, "চাহিদা বা আকাঙ্খাপূরণের ক্ষমতা যদি সমান্তর শ্রেণীতে বৃদ্ধি পায়, তাহলে আকাঙ্খার শক্তিও গুণোত্তর শ্রেণীতে প্রসারিত হয়ে থাকে।"[3]

প্লেটোর (Plato) লেখা সক্রেটিসের সংলাপ (The Socratic Dialogues) একটি প্রশ্নকে ঘিরে গড়ে উঠেছে তা হলো "মূল্যবোধ কি শেখানো যায়?" তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সদ্‌গুণ সর্বকালেই সর্বজনীন, দেশকাল নির্বিশেষে তা অভিন্ন। সদাচার এই সময় এই জায়গায় একরকম, সময়ান্তরে বা স্থানান্তরে অন্যরকম, এমনটি হতে পারে না। সৎ মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া যায় বটে, কিন্তু যিনি শেখাবেন সেই গুরু বা আচার্যকে উপযুক্ত হতে হবে। এই গুরুরা সদ্‌গুণ বা সদাচার কি, মূল্যবোধ কাকে বলে এসব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন না, বরং আমাদের মধ্যকার সহজাত সদ্‌গুণগুলিকে আহ্বান জানান, প্রকাশিত হবার জন্য ডাক দেন। মহান ব্যক্তিরা আমাদের উদ্বোধিত করেন, যাতে আমরা সেই গুণগুলিকে, মূল্যবোধগুলিকে কার্যে পরিণত করি। এ প্রসঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে-

"যদ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।।"[4]

সমাজের বিশিষ্ট বা মহান ব্যক্তিরা যা যা আচরণ করেন, অন্যেরা তার অনুকরণ করে, তাঁরা যা প্রমাণসিদ্ধ বলে বা করণীয় বলে গ্রহণ করেন, সাধারণ লোকে তারই অনুবর্তন করে বিনা বিচারে।

এব্রাহ্যাম্ ম্যাস্লো (Abraham Maslow) তাঁর "মানুষের স্বভাবের দূরবর্তী নাগাল" (Further Reaches of Human Nature) বইয়ে দেখিয়েছেন, "মানুষের সম্ভাবনার সর্বোচ্চ অবস্থাটির কার্যত কোনো সময়েই যথার্থ মূল্যায়ণ করা হয়নি, বরং সেটিকে খাটো করে দেখা হয়েছে।" ম্যাস্লো দেখালেন যে "অলিম্পিকে যারা দৌড় প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়েছে, দৌড় সম্বন্ধে যা কিছু জানার সবই আমরা তাদের কাছ থেকেই শিখি, জনসংখ্যার একটি নির্ভরযোগ্য নমুনা থেকে গড়পড়তা মানের দৌড়বাজদের কাছ থেকে কখনোই তা জানতে বা শিখতে চাইনা।" অনুরূপভাবে, ম্যাস্লো বলেছেন, "আমরা মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক অগ্রগতি, মূল্যবোধের অগ্রগতি অথবা নৈতিক উন্নতির সর্বোচ্চ সম্ভাবনা কতোখানি হতে পারে তা যদি জানতে চাই তাহলে, আমি বলবো যে আমাদের মধ্যে যাঁরা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নৈতিকতাপূর্ণ, সৎ ও সাধুপ্রকৃতির সজ্জন ব্যক্তি, তাঁদের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বা পাঠ করেই তা শিখতে হবে।"

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন নীতিবিদ্যার কোনো বিষয়ে পি. এইচ ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তির নৈতিকতার আদর্শ অপেক্ষা রাখাল বা চাষীর নৈতিকতার আদর্শ অনেক বেশি। কিন্তু আমরা কখনো রাখাল বা চাষীর নৈতিকতার আদর্শকে অনুকরণ করি না।

শ্রী অরবিন্দের মতে, মানুষের মধ্যে পাপ নেই তবে আছে অনেকখানি ব্যাধি, অজ্ঞান আর অপপ্রয়োগ। পাপবোধ দরকার হয়েছিল মানুষের যাতে ঘৃণা আসে তার নিজের দোষত্রুটির ওপর।[5] এ যেন মানুষের অহংকারের ওপর ভগবানের সম্মার্জনী। কিন্তু ভগবানের এই কৌশলটির বিরুদ্ধে মানুষের অহংকার স্থাপন

---

3. গঙ্গোপাধ্যায়, শুভেন্দু। ব্যবস্থাপণা। কলকাতা: ২০১০, পৃঃ ১৪৯।

4. রামসুখদাস, স্বামী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সাধক-সঞ্জীবনী। গোরক্ষপুর: গীতা প্রেস, ২০১১, পৃঃ ২০৪।

5. শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলী ও সুত্রাবলী প্রসঙ্গে। কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, পৃঃ ৯৪।

করলে নিজের পাপ সম্বন্ধে যথাসম্ভব ক্ষীণবোধ এবং অন্যের পাপ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ বোধ দেখা দেয়। জীবন বিকাশের কোন্ পর্বে এসে মানুষ অহংবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে? শ্রী অরবিন্দ এমন প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মানুষকে সচেতন ব্যষ্টিসত্তারূপে গড়ে তোলার জন্য অহং-এর যখন আর প্রয়োজন থাকবে না।

পঞ্চমহাব্রত (Pancamahāvrata): চিত্ত শুদ্ধির তথা মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য জৈন দর্শনে সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র অর্থাৎ ত্রিরত্নের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে সম্যক্ চারিত্র গঠনের জন্য পঞ্চমহাব্রত পালনের কথা বলা হয়েছে। পঞ্চমহাব্রত হলো-(ক) অহিংসা, (খ) সত্য, (গ) অস্তেয়, (ঘ) ব্রহ্মচর্য ও (ঙ) অপরিগ্রহ। এই পঞ্চব্রত সন্ন্যাসী বা শ্রমণের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে পালনীয়, তাই শ্রমণদের ক্ষেত্রে তা পঞ্চমহাব্রত। আর গৃহী বা শ্রাবকদের ক্ষেত্রে এই পঞ্চমহাব্রত অধিকাংশ বা আংশিকভাবে শিথিল করা হয়। তখন এই পঞ্চমহাব্রতই পঞ্চ অনুব্রত নামে পরিচিত। যোগদর্শনে অবশ্য এই পাঁচটি ব্রতকে যম বলা হয়েছে যা আবার অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত।

(ক) অহিংসা: কায়িক, বাচিক ও মানসিকভাবে আঘাত না করাই অহিংসা। জীবহত্যা, কটুকথার দ্বারা অপরকে আঘাত করা, অন্যের ক্ষতি করার চিন্তা প্রভৃতি বর্জনীয়। অপরপক্ষে প্রেম, ভালোবাসা বিতরণ করা প্রয়োজন। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত যোগীদের সান্নিধ্যে হিংস্র প্রাণীও হিংসাভাব পরিত্যাগ করে— ''অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎ সন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।''[6] যদি কোনো ব্যক্তি অহিংসার পূর্ণ আদর্শ উপলব্ধি করতে পারেন তাহলে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হিংস্র প্রাণীও শান্তভাব ধারণ করে। সেই অহিংসা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সামনে ব্যাঘ্র ও মেষশাবক একত্রে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে, তারা কখনো পরস্পরকে হিংসা করে না। এখন প্রশ্ন হলো সত্যি কি হিংস্রপ্রাণী অহিংসা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে হিংসা করা থেকে বিরত থাকবে? বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করা হলো। আমরা পথে চলতে চলতে দেখতে পাই যে, একটি হিংস্র প্রাণীও অহিংসা আচরণকারী পথযাত্রীকে হিংসা করা থেকে বিরত থাকে। এই বিষয়টিকে তখনই পরিষ্কারভাবে বোঝা সম্ভব যখন কোনো জ্ঞাতার 'অহিংস পূর্ণ আদর্শের ধারণা বলতে কি বোঝায় জানা থাকবে। 'অহিংস পূর্ণ আদর্শের ধারণা' হলো এমন এক ধারণা যা উপলব্ধির বিষয়, দৈহিক, মানসিক, ইন্দ্রিয় পশুপ্রবৃত্তি ও সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। যে যোগীর মধ্যে সমস্ত রকম হিংসাত্মক আচরণ লোপ পেয়েছে তাঁকে কখনোই একমুখী হিংস্র প্রাণী হিংসা করে না। বিষয়টি নিউটনের তৃতীয় সূত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূত্রটি হলো প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। এক্ষেত্রে অহিংস প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির দৈহিক কিংবা মানসিক কোনো ক্রিয়াই হিংস্র প্রাণীর প্রতি না হওয়ায় হিংস্র প্রাণীও হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া করা থেকে বিরত থাকে।

(খ) সত্য: চিন্তায় বা বাক্যে মিথ্যা আচরণ না করাই সত্য। যে অপ্রিয় সত্য প্রকাশে অপরের পীড়ার কারণ হয় তা প্রকাশ না করাই ভালো। স্বল্পভনিতা অভ্যাসই সত্যসাধনের প্রকৃষ্ট পথ। সত্য প্রতিষ্ঠিত যোগীর বাক্সিদ্ধি ঘটে –''সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।''[7] যোগস্থ ব্যক্তির সত্য প্রতিষ্ঠিত হলে কোনো কর্ম না

---

6. শর্ম্মা, শ্রীপূর্ণচন্দ্র।পাতঞ্জল যোগদর্শন (সঙ্কলিত)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ (২০০৫), পৃঃ ১৫৩।

7. ভর্গানন্দ, স্বামী। পাতঞ্জল যোগদর্শন (অনূদিত)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪, পৃঃ ১৫৫।

করেও তিনি নিজের জন্য বা অপরের জন্য সেই কর্মের ফললাভের শক্তি অর্জন করতে পারেন। এখন প্রশ্ন হলো সত্য প্রতিষ্ঠিত যোগী যা বলবেন তাই-ই কি সত্য হবে? উত্তরে বলা যায়, যখন যোগীর মধ্যে এই সত্যের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হবে তখন তিনি স্বপ্নেও মিথ্যা কথা ভাবতে পারেন না। যোগস্থ ব্যক্তির কায়মনোবাক্যে যখন সত্য আচরণ পরিলক্ষিত হবে তখন তিনি যা বলবেন তাই-ই সত্য হবে। যেমন তিনি যদি বলেন, তুমি এ বছর চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাহলে সত্য প্রতিষ্ঠিত যোগীর এই উক্তি অবশ্যই সত্য হবে। বাস্তবে উনার উক্তি সত্য হবে না এমন উক্তি তিনি স্বপ্নেও ভাববেন না, বলা তো দূরের কথা। তিনি যদি কোনো পীড়িত ব্যক্তিকে বলেন, 'রোগমুক্ত হও' তাহলে সে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হয়ে যাবেন।

(গ) অস্তেয়: যা নিজের নয় এমন দ্রব্য গ্রহণ না করা অর্থাৎ চুরি না করাই অস্তেয়। অন্যায়পূর্বক ও ছল চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে পরের দ্রব্যকে নিজের করে নেওয়া হলো 'স্তেয়' বা চুরি। সরকারি কর ফাঁকি দেওয়া, ঘুষ নেওয়াও এর অন্তর্গত। চিত্তে যখন এই সমস্ত মলের অনস্তিত্ব হয় তখন তা হয় 'অস্তেয়'। যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মতে মনে, বাক্যে এবং কর্মে পরের দ্রব্যে স্পৃহা না করাই অস্তেয়- ''কর্মণা মনসা বাচা পরদ্রব্যেষু নিস্পৃহঃ। অস্তেয়মিতি সম্প্রোক্তং ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।"[8] অস্তেয়ের ভাবনা মন, বুদ্ধি ও কর্মের দ্বারা করা উচিত। যখন কোনো সাধকের অস্তেয় ধর্মতে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন তার কোনো বস্তু কেউ অপহরণ করে না বরং সাধকের সাংসারিক ঐশ্বর্য স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হলে যোগীর কাছে সর্বরত্ন বা উত্তমদ্রব্য উপস্থিত হয়—''অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্।"[9] এখন প্রশ্ন হলো অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কি সর্বদাই উত্তমদ্রব্য উপস্থিত থাকবে? যদি থাকে তাহলে কীভবে তা সম্ভব? এর উত্তরে বলা যায় সাধকের কোনো বস্তুরই অভাব থাকে না। সাধক যে বস্তুর ইচ্ছা করেন তিনি তা স্বয়ং পেয়ে যান। অর্থাৎ সংসারের ঐশ্বর্য ঐ মহাপুরুষের পিছনে ছুটতে থাকে- ''তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।"[10]

(ঘ) ব্রহ্মচর্য : কাম বিষয়ক আচরণ এবং চিন্তা থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ জনন ইন্দ্রিয়ের সংযমই ব্রহ্মচর্য। এর অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা, মিতাহারি, মিতনিদ্রা এবং সর্বপ্রকার কাম চিন্তা বর্জনীয়। অর্থাৎ মনোবোক্য ও শরীরের দ্বারা কৃত যাবতীয় মৈথুনের সর্বথা ত্যাগ এবং বীর্যরক্ষা করা হলো ব্রহ্মচর্য — ''কর্মণা মনসা সর্বাবস্থাসু সর্বদা। সর্বত্র মৈথুন ত্যাগী ব্রহ্মচর্যং প্রবক্ষতে।।"[11] ব্রহ্মচর্য পালন অবস্থায় আট প্রকার মৈথুন পরিত্যাগ করার নির্দেশ যোগশাস্ত্রে পাওয়া যায় —

(ক) কোনো নারীর স্মরণ না করা। (খ) কোনো নারীর রূপগুনের চর্চা না করা। (গ) কোনো নারীর সাথে খেলা-ধূলা না করা। (ঘ) কারোর যৌবন তথা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে বারবার না দেখা। (ঙ) কোনো নারীর

---

8. গিরি, স্বামী নিত্যানন্দ। ক্রিয়াযোগ সাধনতত্ত্ব (যা, সং, ১/৫৪)। কলকাতা: স্বামী শুদ্ধানন্দ ক্রিয়াযোগ আশ্রম, ১৪১২ (বঙ্গাব্দ), পৃঃ ৮৪।

9. হরিহরানন্দ আরণ্য, শ্রীমৎ স্বামী। পাতঞ্জল যোগদর্শন (সম্পাদিত)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮, পৃঃ ১৯৩।

10. গোপ, অধ্যাপক যুধিষ্টির। ঈশোপনিষদ (সম্পাদিত)। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৫, পৃঃ ১২।

11. গিরি, স্বামী নিত্যানন্দ। ক্রিয়াযোগ সাধনতত্ত্ব। কলকাতা: স্বামী শুদ্ধানন্দ ক্রিয়াযোগ আশ্রম (১৪১২ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ৮৫।

সাথে একা বা একান্তে বাক্যালাপ না করা। (চ) কোনোরূপ ভোগবিলাসের কথাবার্তা চিন্তা না করা। (ছ) কোনো নারীকে পাওয়ার কামনা না করা। (জ) কামনাকে পূরণ করার জন্য কোনো প্রকার প্রয়াস না করা। ব্রহ্মচর্য অনুশীলন করলে সাধকের বীর্যলাভ হয়—"ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ।"[12] এখন প্রশ্ন হলো ব্রহ্মচর্য ব্যক্তির কীভাবে শক্তিলাভ হয়? এই শক্তি শারীরিক না মানসিক? উত্তরে বলা যায়, বীর্য সম্পূর্ণ শরীরের আধার এবং পুষ্টিদায়ক। এর সাহায্যে শরীরের শক্তির হ্রাস না হয়ে বরং শরীর ও মন উভয়ই পুষ্ট ও প্রসন্ন থাকে। যেমন দুধ থেকে ঘি, ইক্ষু থেকে গুড় হয় তেমনি সমস্ত খাদ্যের সার বীর্যে পরিণত হয়। বীর্য থেকেই মন ও বুদ্ধির বিকাশ হয়। সুতরাং এই শক্তি শারীরিক ও মানসিক উভয়ই। ব্রহ্মচর্যবান ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি-মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে।

(ঙ) অপরিগ্রহ: কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের উপযুক্ত দ্রব্য গ্রহণ করাই অপরিগ্রহ। ভোগের বিষয়ে চিন্তায় ব্যাপৃত থাকলে যোগসাধনের অবসর থাকে না, তাই তা বর্জনীয়। অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হলে যোগী অতীত, অনাগত ও বর্তমান জন্মবৃত্তান্ত সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়—"অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ।"[13] উপরোক্ত পাঁচ প্রকার যম যদি সার্বভৌম হয় তাহলে এদেরকে মহাব্রত বলে। এখন প্রশ্ন হলো অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত যোগীর যদি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ত্রিকালের জ্ঞান হয়ে থাকে তাহলে তিনি কি জানতে পারেন আমি কে? কোথায় ছিলাম? কীভাবে ছিলাম? মৃত্যুর পর কী অবস্থায় থাকব? উত্তরে বলা যায়, এরূপ যোগীর জন্মের পূর্বে এবং মৃত্যুর পর পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞান হয়ে যায়। নিজের জন্ম সম্বন্ধিত জিজ্ঞাসার কৌতুহল আর থাকে না। স্বাভাবিকভাবে সম্যকজ্ঞানের উদয় হয়। এইটি যমাঙ্গের স্থিরতা হয়ে যাওয়ায় এরূপ সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়ে থাকে।

পুরুষার্থ (Puruṣārtha): 'পুরুষ' শব্দের ব্যুৎপত্তি হলো — পূঃ=পুরং শরীরং চ। পুরি শেতে ইতি পুরুষঃ।[14] অর্থাৎ যিনি এই সমস্ত শরীরে শয়ন করেছেন, দেহে প্রবেশ করেছেন, দেহে অবস্থান করেছেন, সেই জীবকে 'পুরুষ' বলে। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে, 'পুরুষ' শব্দের যৌগিক অর্থ হলো একটি জীব। কিন্তু 'পুরুষসত্ত্বে চ বিস্তারামাত্মা।'[15] এই 'পুরুষার্থ' শব্দটি 'পুরুষ' এবং 'অর্থ' শব্দদ্বয়ে নিষ্পন্ন হয়েছে। আর 'পুরুষাণাম্ অর্থঃ পুরুষার্থঃ' অথবা 'পুরুষৈঃ অর্থ্যতে ইতি পুরুষার্থঃ।'[16] এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে পুরুষের কাছে যা কাঙ্খিত, অর্থাৎ মানুষ যে ফল কামনা করে, তার নাম- পুরুষার্থ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, সমগ্র জগতের প্রায় সমস্ত বিষয়ই পুরুষের ইচ্ছা, কিন্তু বেদ, উপনিষদ, অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে কেবলমাত্র চারটিকেই মানবজীবনের, সকলের প্রধান কামনা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই মানুষের প্রধান আকাঙ্খার বিষয়গুলোকে বলা হয় পুরুষার্থ। মানুষের কাঙ্ক্ষিত এই চারটি পুরুষার্থ হলো — ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। সকল মানুষের সুখের জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ও সুখের উপায় রয়েছে, তাদের বলা হয় পুরুষার্থ। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মানুষ যা চায়, তাদের সবারই এই চারটি লক্ষ্যের

---

12. প্রেমানন্দ, স্বামী। পাতঞ্জল যোগদর্শন (ব্যাখ্যাত)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয় (২০১৮), পৃঃ ৪০।

13. ভর্গানন্দ, স্বামী।পাতঞ্জল যোগদর্শন। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪, পৃঃ ১৫৭।

14. ত্রিপাঠী, প্রেমবল্লম। পুরুষার্থ-চতুষ্টয় (সম্পাদিত)। বারাণসী: বারাণসেয়-সংস্কৃত-বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৫।

15 . তদেব।

16. তদেব।

কোন না কোন লক্ষ্য থাকে। কিছু লোক ধর্মের জন্য লক্ষ্য করে, কেউ যৌনতার পরিপূর্ণতা চায়, এবং কেউ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে। পরমাত্মা জীবের জন্য বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণশক্তি সৃষ্টি করেছেন। এর মাধ্যমে জীবাত্মা বা মানুষ সকল প্রাণের দ্বারা, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা, মন দ্বারা এবং তত্ত্বের চিন্তার দ্বারা জীবন লাভ করতে পারেন। যারা বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ব নির্ধারণ করেন, তারা আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে। ভারতীয় তথাকথিত ধর্মনীতিতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-এই চার পুরুষার্থ স্বীকারের মধ্যেই নিহিত হয়ে আছে বৈদিক জীবন জিজ্ঞাসার মূল বাণী। পারস্পরিক এক নিবিড় সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে গ্রথিত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ ধারণা হিন্দু জীবনদর্শনের যথাযথ পরিচায়ক। বৈদিক ধর্মনীতির সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেতে হলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ — এই চারটি পুরুষার্থের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে কোন একটি বা কয়েকটি নির্দিষ্ট গ্রন্থ কিংবা দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবাদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে পুর্ণাঙ্গরূপ বোঝা যাবে না। তাই বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদির আলোচনা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। তবে এক্ষেত্রে ভারতীয় দার্শনিকদের মত সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

মুক্তির স্বরূপ বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। চার্বাক মতে, দেহের উচ্ছেদই মোক্ষ বা মুক্তি — ''দেহচ্ছেদো মোক্ষঃ।''[17] বৌদ্ধ মতে রাগাদি বিজ্ঞান ধারার নিরোধই নির্বাণ বা মুক্তি — ''রাগাদি বিজ্ঞানসন্তানবাসনাচ্ছেদসম্ভবাচতুর্নামপি বৌদ্ধনাং মুক্তিরেখা প্রকীর্তিতা।।''[18] জৈনমতে বন্ধ হেতু সমূহের নিরোধের দ্বারা আত্মা থেকে কর্ম পুদ্গলের সম্পূর্ণ বিযুক্তি হওয়াই মুক্তি - ''বন্ধহেত্বভাবনির্জরাংভ্যাং কৃৎস্নকর্মবিপ্রমোক্ষণং মোক্ষঃ।''[19] সাংখ্যমতে ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কৈবল্য বা মুক্তি বা পুরুষার্থ — ''অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।''[20] যোগ দার্শনিক পতঞ্জলির মতে সত্ত্ব ও পুরুষের শুদ্ধিসাম্য হলে কৈবল্য লাভ হয় -''সত্ত্বপুরুষয়োঃ শূদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি।''[21] মীমাংসক কুমারিল ভট্টের মতে প্রপঞ্চ সম্বন্ধের বিলয় হলো মোক্ষ। গাগাভট্ট বলেন যে গুরুমতে আত্যন্তিক দুঃখের প্রাগভাব হলো মোক্ষ- আত্যন্তিকদুঃখপ্রাগভাবো মোক্ষ ইতি গুরবঃ।''[22] প্রভাকরের মোক্ষ বিষয়ে মত নৈয়ায়িকের কাছাকাছি। তাঁর মতে ধর্ম এবং অধর্ম অদৃষ্ট হওয়ায় পরিণাম স্বরূপ শরীরের পূর্ণত নিরোধ হলো মোক্ষ। ভাসর্বজ্ঞ ও একদেশী মীমাংসক মতে নিত্য সুখের অভিব্যক্তিই মুক্তি। অদ্বৈত বেদান্ত মতে সর্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরমানন্দাত্মক ব্রহ্মস্বরূপিতা প্রাপ্তির নাম মুক্তি — ''ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ।''[23] ''ব্রহ্মৈব হি মুক্ত্যবস্থা।''[24] বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে ব্রহ্মসাযুজ্যই অপবর্গ বা মুক্তি — ''ব্রহ্মভাবরূপো

---

17. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরিদাস। ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা। কলকাতা: ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিসিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৯৬৬, পৃঃ ২১।
18. চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৭।
19. তদেব, পৃঃ ৭৪।
20. সরস্বতী, স্বামী দর্শনানন্দ। *সাংখ্য-দর্শন (অনুবাদিত)*। দিল্লি: লক্ষণ পথিক, ২০০০, পৃঃ ১।
21. ভর্গানন্দ, স্বামী।পাতঞ্জল যোগদর্শন। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪, পৃঃ ২৫৭।
22. ভাট্টচিন্তামণি, পৃঃ ৪২।
23. বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী। বেদান্ত দর্শন (প্রথম অধ্যায়)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৮, পৃঃ ১৭৭।
24. তদেব, (দ্বিতীয় অধ্যায়) পৃঃ ৭৩৩

মোক্ষঃ।"[25] ন্যায়মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অপবর্গ বা মুক্তি — "তদত্যন্তবিমোক্ষঃ অপবর্গঃ।"[26] ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে সকল প্রকার দুঃখের নিবৃত্তি বা বিমোক্ষই অপবর্গরূপ মুক্তি — "সর্বদুঃখবিমোক্ষঃ অপবর্গঃ।"[27] ন্যায় মতে, মিথ্যাজ্ঞানাদি ক্রমে দুঃখের নাশ হলে অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হলে দোষের নাশ হয়,দোষের নাশে প্রবৃত্তির নাশ হয়। প্রবৃত্তির নাশ হলে জন্মের নাশ হয়, জন্মের নাশ হলে দুঃখের নাশ হয়। এইভাবে উত্তরোত্তরপায়ে মিথ্যাজ্ঞান থেকে দুঃখের নাশ হলে অপবর্গ সম্ভব হয় — "দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি - দোষ-মিথ্যাজ্ঞানা- নামুত্তরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপয়াদপবর্গঃ।"[28] এই কারণে ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বলেছেন, মিথ্যাজ্ঞানের নাশ একমাত্র আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারেই সম্ভব — "আত্মাদেঃ খলু প্রমেয়স্য তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"[29] বৈশেষিক মত ন্যায় মতের অনুরূপ। এই মতেও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স। মহর্ষি কণাদের মতে শরীরের সঙ্গে আত্মার সর্বপ্রকার সংযোগ বা সংসর্গ বিচ্ছিন্ন করে আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষরূপ মুক্তি — "তদভাবে সংযোগাভাবঃ অপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ।"[30]

উপসংহার : আত্মসচেতন মণাডরূপী এমন কোনো মানুষ নেই যিনি ভালো থাকতে চান না। পৃথিবীতে সকল মানুষ অহিংসাদি ব্রত পালনের মাধ্যমে যেমন নিজে ভালো থাকতে চান তেমনি অপরকে ভালো রাখতে চান। কিন্তু বর্তমান সমাজে দার্শনিক জ্ঞান বহির্ভূত কিছু মানুষ পঞ্চমহাব্রত পালনের মাধ্যমে নিজে ভালো থাকতে তো জানেই না অপরকেও ভালো থাকতে দেন না। সুখবাদীদের মতে, আমাদের সকলের সুখ কামনা করা উচিৎ। তবে সুখকে পেতে হলে কেবল স্বার্থপর হলে হবে না, পরার্থপরও হতে হবে। তাই বলা হয় এই পৃথিবীতে যত অধিক লোকের মঙ্গল সাধিত হয় ততই শুভ বা ভালো। হেগেল বলেছেন, পরার্থপর হয়ে সমাজের লোকের কল্যাণ করলে নিজের কল্যাণ হয়। আদর্শবাদীরা মনে করেন, মানসিক শান্তিই প্রকৃত শান্তি। তবে এই শান্তিলাভ একমাত্র দার্শনিক জ্ঞানলাভের মাধ্যমেই সম্ভব। প্রকৃত বাস্তবসম্মত জ্ঞানের অভাবে দেখা যায়, পুঁথিগত নীতিবিদ্যায় গবেষণা করার পরেও সংসার জীবনে একজন মানুষ ভালো থাকতে পারে না। এমনকি নিজের জন্মদাতা বাবা-মায়ের সাথেও সুখে শান্তিতে থাকতে পারে না। সুতরাং দার্শনিকজ্ঞান মানুষের জীবনে আবশ্যিক।

---

25. রামানুজাচার্য্য, শ্রীযতীন্দ্র। শ্রীভাষ্য (১ম খণ্ড)। কলকাতা: শ্রীবলরাম ধর্ম সোপান, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩১৪।
26. তর্কবাগীশ, ফণীভূষ। ন্যায়দর্শন (প্রথমখন্ড)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, ১৯১১ পৃঃ ,২৩৩।
27. তদেব, ভাষ্য, পৃঃ ২৩৩।
28. তর্কবাগীশ, ফণীভূষণ। ন্যায়দর্শন (প্রথমখন্ড)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, ১৯১১, পৃঃ ৬৩।
29. তদেব, ভাষ্য পৃঃ ২২।
30. ভট্টাচার্য্যতর্করত্ন, শ্রীপঞ্চানন। বৈশেষিক দর্শনম্ (সম্পাদিত)। কলকাতা: শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা প্রকাশিত, ১৩১৩ (বঙ্গাব্দ), পৃঃ ৩১২।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। গিরি, স্বামী নিত্যানন্দ। ক্রিয়াযোগ সাধনতত্ত্ব। কলকাতা: স্বামী শুদ্ধানন্দ ক্রিয়াযোগ আশ্রম, ১৪১২ (বঙ্গাব্দ)।
২। গোপ, অধ্যাপক যুধিষ্টির। ঈশোপনিষদ (সম্পাদিত)। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৫।
৩। চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৪১৬ (বঙ্গাব্দ)।
৪। তর্কবাগীশ, ফণীভূষণ। ন্যায়দর্শন (প্রথমখন্ড)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, ১৯১১।
৫। ত্রিপাঠী, প্রেমবল্লম। পুরুষার্থ-চতুষ্টয় (সম্পাদিত)। বারাণসী: বারাণসেয়-সংস্কৃত-বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০।
৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরিদাস। ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা। কলকাতা: ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিসিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৯৬৬।
৭। বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী। বেদান্ত দর্শন (প্রথম অধ্যায়)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৮।
৮। ভর্গানন্দ, স্বামী।পাতঞ্জল যোগদর্শন। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪।
৯। ভট্টাচার্য্যতর্করত্ন, শ্রীপঞ্চানন। বৈশেষিক দর্শনম্ (সম্পাদিত)। কলকাতা: শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা প্রকাশিত, ১৩১৩ (বঙ্গাব্দ)।
১০। মণ্ডল, রাসপতি। শান্তি ও সংঘর্ষ সমাধানের দর্শন। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০২৪।
১১। রামসুখদাস, স্বামী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সাধক-সঞ্জীবনী। গোরক্ষপুর: গীতা প্রেস, ২০১১।
১২। রামানুজাচার্য্য, শ্রীযতীন্দ্র। শ্রীভাষ্য (১ম খণ্ড)। কলকাতা: শ্রীবলরাম ধর্ম সোপান, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।
১৩। শর্ম্মা, শ্রীপূর্ণচন্দ্র।পাতঞ্জল যোগদর্শন (সঙ্কলিত)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৫।
১৪। শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলী ও সুত্রাবলী প্রসঙ্গে। কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির।
১৫। হরিহরানন্দ আরণ্য, শ্রীমৎ স্বামী। পাতঞ্জল যোগদর্শন (সম্পাদিত)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮।
১৬। সরস্বতী, স্বামী দর্শনানন্দ। সাংখ্য-দর্শন (অনুবাদিত)। দিল্লি: লক্ষণ পথিক, ২০০০,
17. Henry, Dr. Sidgwick. The Methods of Ethics. London: Macmillan and Co. 1877.
18. Sinha, Jadunath. Indian Philosophy (Vol-1). London: NCBA, 2012.